সমকাল

23 JUN 2026

কর্মশালায় প্রাণিসম্পদমন্ত্রী

ইলিশ রপ্তানি বাড়াতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

■ সমকাল প্রতিবেদক

আমিন উর রশিদ

দেশের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে ইলিশ রপ্তানির সক্ষমতা বাড়াতে বিজ্ঞানভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ।

গতকাল সোমবার রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইলিশ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে শুধু অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ, উৎপাদন বাড়ানো এবং আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে সমন্বিত ও গবেষণাভিত্তিক উদ্যোগ নিতে হবে।

ইলিশের নিরাপদ বিচরণ ও প্রজননের জন্য নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখা এবং পানির গুণগত মান নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, শিল্পবর্জ্য ও বিষাক্ত পদার্থ নদীতে নিঃসরণ বন্ধে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

মন্ত্রী জানান, জাটকা নিধন, মা ইলিশ আহরণ এবং কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে। অবৈধ জালের ব্যবহার শুধু ইলিশ নয়, অন্য দেশীয় মাছের অস্তিত্বের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে এসব জাল ব্যবহারের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

জেলেদের জীবনমানের উন্নয়ন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সরকার বিভিন্ন বাস্তবমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ভবিষ্যতে আরও নতুন উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ উপদেষ্টা দল গঠনের বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে বলেও জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, এ দলের সুপারিশের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, বিশ্বের মোট ইলিশের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশের ইলিশের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

তিনি বলেন, ইলিশকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষণার বিকল্প নেই।

প্রথম আলো
23 JUN 2026

চাষের মাছে শীর্ষ পাঁচে, আহরণে দ্বিতীয় স্থানে

বিশ্বে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন দেখাচ্ছে, বাংলাদেশে চাষ থেকে মাছ উৎপাদিত হয় ২৯ লাখ ৭৮ হাজার টন, আহরিত হয় ১৪ লাখ টন।

পার্থ শঙ্কর সাহা, *ঢাকা*

বার্ষিক মাছ চাষ

চীন	৫ কোটি ৭৫ লাখ টন
ভারত	১ কোটি ২০ লাখ টন
ইন্দোনেশিয়া	৫৯ লাখ টন
ভিয়েতনাম	৫৬ লাখ টন
বাংলাদেশ	২৯ লাখ টন

বার্ষিক মাছ আহরণ

ভারত	২১ লাখ টন
বাংলাদেশ	১৪ লাখ টন
চীন	১১ লাখ টন
মিয়ানমার	১০ লাখ টন
উগান্ডা	৫ লাখ টন

বিশ্বে মিঠাপানির মাছ উৎপাদনের কেন্দ্র ক্রমেই এশিয়ার দিকে সরছে। আর তাতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য দেখাচ্ছে, মাছসহ জলজ প্রাণী উৎপাদন বা চাষে বিশ্বে পঞ্চম স্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। আর অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মাছ আহরণে বাংলাদেশের ওপরে ভারত ছাড়া আর কেউ নেই।

এফএওর প্রকাশিত 'দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০২৬' প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে ২০২৪ সালের তথ্যের ভিত্তিতে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালে বিশ্বে মাছসহ জলজ খাতের মোট উৎপাদন রেকর্ড ২৩ কোটি ৫০ লাখ টনে পৌঁছায়। এর মধ্যে ১৯ কোটি ৫০ লাখ টন ছিল জলজ প্রাণী এবং ৪ কোটি টন ছিল শৈবাল। এ খাতের বিক্রয়মূল্য ছিল প্রায় ৫৬ হাজার কোটি মার্কিন ডলার।

বিভিন্ন দেশে জলজ চাষের মধ্যে মাছের পাশাপাশি আরও নানা কিছু থাকলেও বাংলাদেশে জলজ চাষ বলতে মূলত মাছই বোঝায়। জলজ প্রাণী চাষে চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ভিয়েতনামের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। অন্যদিকে চাষের বাইরে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে জলজ প্রাণী আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। আহরণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশে মূলত মাছই ধরা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে মাছ চাষে বড় ধরনের অগ্রগতি এসেছে, যা অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে, দেশের জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২ দশমিক ৫৩ শতাংশ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকুয়াকালচার বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহফুজুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, সেই আশির দশক থেকেই চাষের মাছের ক্ষেত্রে তৎপরতা শুরু হয়েছিল। এখন সেখানে শিক্ষিত খামারিও এসেছেন অনেক। আবার উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের যে কাঠামো, তা অনেক দেশের নেই।

এফএওর আগের প্রতিবেদনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ আগে যে অবস্থানে ছিল, তা-ই ধরে রেখেছে। তবে সর্বশেষ প্রতিবেদনে একটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখা গেছে চিংড়ি উৎপাদনে। এ ক্ষেত্রে আগেরবার বাংলাদেশ চতুর্দশ স্থানে থাকলেও এবার এক ধাপ এগিয়েছে।

চাষে নতুন রেকর্ড

এফএওর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে জলজ প্রাণী উৎপাদন নতুন রেকর্ড গড়ে ১৪ কোটি ২০ লাখ টনে পৌঁছেছে। এর বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় ৩৯ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। মোট উৎপাদনের ৫১ শতাংশ ছিল আহরণ এবং ৪৯ শতাংশ ছিল চাষ। আবার মোট এসেছে চাষ থেকে, যা ২০২২ সালে ছিল ৫১ দশমিক ২ শতাংশ।

বিশ্বে মাছ উৎপাদনে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দেশ চীনে মোট জলজ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের ৮১ দশমিক ৬ শতাংশই এসেছে চাষ থেকে। বিশ্বের মোট জলজ প্রাণী উৎপাদনে চীনের অংশ ৫৬ শতাংশ, ভারতের ১২ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ৬ শতাংশ, ভিয়েতনামের ৫ শতাংশ এবং বাংলাদেশের ৩ শতাংশ।

বাংলাদেশের শক্তি অভ্যন্তরীণ জলাশয়

এফএওর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের খামারভিত্তিক জলজ প্রাণী উৎপাদনের ৬৩ শতাংশই আসে মিঠাপানির জলাশয় থেকে। ২০২৪ সালে মিঠাপানির জলাশয় থেকে উৎপাদিত হয়েছে ৬ কোটি ৪০ লাখ টন। বিপরীতে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় এলাকা থেকে এসেছে ৩ কোটি ৮০ লাখ টন।

অর্থাৎ বৈশ্বিক মাছ চাষের প্রধান ভিত্তি এখন স্বাদুপানির পরিবেশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে বিশ্বের অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মাছ আহরণ ১ কোটি ২৩ লাখ টনে পৌঁছেছে, যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বড় সাফল্যের চিত্র উঠে এসেছে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মাছ আহরণের ক্ষেত্রে। এতে বলা হয়, তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার উন্নতির কারণে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মাছ আহরণ বেড়েছে।

বিশ্বে অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মাছ আহরণে শীর্ষে থাকা ভারতে ২০২৪ সালে আহরণের পরিমাণ ছিল ২১ লাখ ৭৬ হাজার টন। একই সময়ে বাংলাদেশে আহরিত হয় ১৪ লাখ ১২ হাজার টন, যা বিশ্ব মোট আহরণের ১১ দশমিক ৫ শতাংশ। চীন ১১ লাখ ৬৩ হাজার টন আহরণ নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ইলিশ আহরণে বিশ্বে শীর্ষস্থানে রয়েছে। চাষের ক্ষেত্রে তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ এবং

চাষেই ভবিষ্যৎ

এফএওর প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে ২০২৪ সালে উৎপাদিত জলজ প্রাণীর ৮৯ শতাংশই মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মাথাপিছু জলজ খাদ্যের প্রাপ্যতা পৌঁছেছে ২১ দশমিক ৩ কেজিতে।

মিঠাপানির মাছ চাষে উৎপাদন বাড়লেও পরিবেশগত স্থায়িত্ব, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতে জোর দিচ্ছে এফএও। সংস্থাটি বলেছে, বিশ্ব ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যচাহিদা পূরণে আগামী দিনগুলোতে অ্যাকুয়াকালচার বা চাষের মাছ প্রধান ভরসা হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের মাছ ও চিংড়ি খামারের মালিকদের সংগঠন ফিশ ফর্ম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ফোয়াব) সভাপতি মোল্লা শামসুর রহমান শাহীন *প্রথম আলোকে* বলেন, চাষের মাছের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে 'বিপ্লব' ঘটেছে। কিন্তু খামারিদের বিমার সুবিধা, উন্নত পোনা, মাছের ভালো মানের খাদ্য ও সহনীয় দামের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। এর পাশাপাশি উন্নত বাজার ব্যবস্থাপনাও একটি সংকট। যেগুলোতে নীতি সহায়তার অভাব আছে।

দেশে মাছ উৎপাদনে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি গবেষকেরা স্বীকার করেন। তবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছ আহরণের হিসাব নিয়ে তাদের কারও কারও সংশয় রয়েছে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহফুজুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে সবচেয়ে বেশি আহরিত হয় ইলিশ। এর পাশাপাশি অন্য মাছগুলো কতটা ধরা পড়ে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তবে চাষের ক্ষেত্রে যে বিরাট অগ্রগতি হয়েছে, তা সন্দেহাতীত।

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছ আহরণের তথ্য নিয়ে গবেষকদের সন্দেহের বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. খালেদ কনক *প্রথম আলোকে* বলেন, যেকোনো বিষয় নিয়েই যে কেউ সন্দেহ করতে পারেন। সেই অবকাশ আছে।

আহরণে দ্বিতীয় স্থানে

বিশ্বে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন দেখাচ্ছে, বাংলাদেশে চাষ থেকে মাছ উৎপাদিত হয় ২৯ লাখ ৭৮ হাজার টন, আহরিত হয় ১৪ লাখ টন।

পার্থ শঙ্কর সাহা, *ঢাকা*

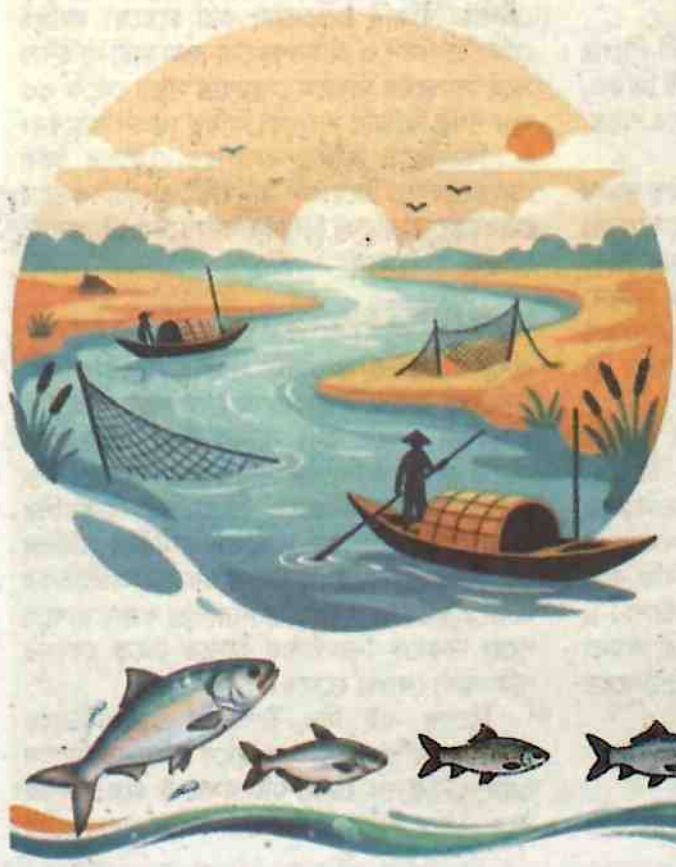

বার্ষিক মাছ চাষ

চীন	৫ কোটি ৭৫ লাখ টন
ভারত	১ কোটি ২০ লাখ টন
ইন্দোনেশিয়া	৫৯ লাখ টন
ভিয়েতনাম	৫৬ লাখ টন
বাংলাদেশ	২৯ লাখ টন

বার্ষিক মাছ আহরণ

ভারত	২১ লাখ টন
বাংলাদেশ	১৪ লাখ টন
চীন	১১ লাখ টন
মিয়ানমার	১০ লাখ টন
উগান্ডা	৫ লাখ টন

বিশ্বে মিঠাপানির মাছ উৎপাদনের কেন্দ্র ক্রমেই এশিয়ার দিকে সরছে। আর তাতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য দেখাচ্ছে, মাছসহ জলজ প্রাণী উৎপাদন বা চাষে বিশ্বে পঞ্চম স্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। আর অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মাছ আহরণে বাংলাদেশের ওপরে ভারত ছাড়া আর কেউ নেই।

এফএওর প্রকাশিত 'দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০২৬' প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে ২০২৪ সালের তথ্যের ভিত্তিতে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালে বিশ্বে মাছসহ জলজ খাতের মোট উৎপাদন রেকর্ড ২৩ কোটি ৫০ লাখ টনে পৌঁছায়। এর মধ্যে ১৯ কোটি ৫০ লাখ টন ছিল জলজ প্রাণী এবং ৪ কোটি টন ছিল শৈবাল। এ খাতের বিক্রয়মূল্য ছিল প্রায় ৫৬ হাজার কোটি মার্কিন ডলার।

বিভিন্ন দেশে জলজ চাষের মধ্যে মাছের পাশাপাশি আরও নানা কিছু থাকলেও বাংলাদেশে জলজ চাষ বলতে মূলত মাছই বোঝায়। জলজ প্রাণী চাষে চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ভিয়েতনামের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। অন্যদিকে চাষের বাইরে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে জলজ প্রাণী আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। আহরণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশে মূলত মাছই ধরা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে মাছ চাষে বড় ধরনের অগ্রগতি এসেছে, যা অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে, দেশের জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২ দশমিক ৫৩ শতাংশ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকুয়াকালচার বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহফুজুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, সেই আশির দশক থেকেই চাষের মাছের ক্ষেত্রে তৎপরতা শুরু হয়েছিল। এখন সেখানে শিক্ষিত খামারিও এসেছেন অনেক। আবার উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের যে কাঠামো, তা অনেক দেশের নেই।

এফএওর আগের প্রতিবেদনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ আগে যে অবস্থানে ছিল, তা-ই ধরে রেখেছে। তবে সর্বশেষ প্রতিবেদনে একটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখা গেছে চিংড়ি উৎপাদনে। এ ক্ষেত্রে আগেরবার বাংলাদেশ চতুর্দশ স্থানে থাকলেও এবার এক ধাপ এগিয়েছে।

চাষে নতুন রেকর্ড

এফএওর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে জলজ প্রাণী উৎপাদন নতুন রেকর্ড গড়ে ১৪ কোটি ২০ লাখ টনে পৌঁছেছে। এর বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় ৩৯ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। মোট উৎপাদনের ৫১ শতাংশ ছিল আহরণ এবং ৪৯ শতাংশ ছিল চাষ। আবার মোট উৎপাদনের ৩৩ শতাংশ আসে অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে।

২০২১ সাল থেকে জলজ প্রাণী উৎপাদনে মাছ চাষের (অ্যাকুয়াকালচার) অবদান প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরিত মাছের (ক্যাপচার ফিশারিজ) উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায়। ২০২৪ সালে বিশ্বে মোট জলজ প্রাণী উৎপাদনের ৫২ দশমিক ৮ শতাংশ এসেছে চাষ থেকে, যা ২০২২ সালে ছিল ৫১ দশমিক ২ শতাংশ।

বিশ্বে মাছ উৎপাদনে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দেশ চীনে মোট জলজ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের ৮১ দশমিক ৬ শতাংশই এসেছে চাষ থেকে। বিশ্বের মোট জলজ প্রাণী উৎপাদনে চীনের অংশ ৫৬ শতাংশ, ভারতের ১২ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ৬ শতাংশ, ভিয়েতনামের ৫ শতাংশ এবং বাংলাদেশের ৩ শতাংশ।

বাংলাদেশের শক্তি অভ্যন্তরীণ জলাশয়

এফএওর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের খামারভিত্তিক জলজ প্রাণী উৎপাদনের ৬৩ শতাংশই আসে মিঠাপানির জলাশয় থেকে। ২০২৪ সালে মিঠাপানির জলাশয় থেকে উৎপাদিত হয়েছে ৬ কোটি ৪০ লাখ টন। বিপরীতে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় এলাকা থেকে এসেছে ৩ কোটি ৮০ লাখ টন।

অর্থাৎ বৈশ্বিক মাছ চাষের প্রধান ভিত্তি এখন স্বাদুপানির পরিবেশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে বিশ্বের অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মাছ আহরণ ১ কোটি ২৩ লাখ টনে পৌঁছেছে, যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বড় সাফল্যের চিত্র উঠে এসেছে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মাছ আহরণের ক্ষেত্রে। এতে বলা হয়, তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার উন্নতির কারণে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মাছ আহরণ বেড়েছে।

বিশ্বে অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মাছ আহরণে শীর্ষে থাকা ভারতে ২০২৪ সালে আহরণের পরিমাণ ছিল ২১ লাখ ৭৬ হাজার টন। একই সময়ে বাংলাদেশে আহরিত হয় ১৪ লাখ ১২ হাজার টন, যা বিশ্ব মোট আহরণের ১১ দশমিক ৫ শতাংশ। চীন ১১ লাখ ৬৩ হাজার টন আহরণ নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ইলিশ আহরণে বিশ্বে শীর্ষস্থানে রয়েছে। চাষের ক্ষেত্রে তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ এবং এশিয়ায় তৃতীয়।

মাছ চাষের ক্ষেত্রে পঞ্চম স্থানে থাকা বাংলাদেশের ২০২৪ সালে উৎপাদন ছিল ২৯ লাখ ৭৮ হাজার টন। এ ক্ষেত্রে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে থাকার ভারতের উৎপাদন ছিল ১ কোটি ২০ লাখ টন। মাছ চাষে শীর্ষে থাকা চীনের উৎপাদন ৫ কোটি ৭৫ লাখ টন।

চাষেই ভবিষ্যৎ

এফএওর প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে ২০২৪ সালে উৎপাদিত জলজ প্রাণীর ৮৯ শতাংশই মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মাথাপিছু জলজ খাদ্যের প্রাপ্যতা পৌঁছেছে ২১ দশমিক ৩ কেজিতে।

মিঠাপানির মাছ চাষে উৎপাদন বাড়লেও পরিবেশগত স্থায়িত্ব, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতে জোর দিচ্ছে এফএও। সংস্থাটি বলেছে, বিশ্ব ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যচাহিদা পূরণে আগামী দিনগুলোতে অ্যাকুয়াকালচার বা চাষের মাছ প্রধান ভরসা হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের মাছ ও চিংড়ি খামারের মালিকদের সংগঠন ফিশ ফর্ম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ফোয়াব) সভাপতি মোল্লা শামসুর রহমান শাহীন *প্রথম আলোকে* বলেন, চাষের মাছের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে 'বিপ্লব' ঘটেছে। কিন্তু খামারিদের বিমার সুবিধা, উন্নত পোনা, মাছের ভালো মানের খাদ্য ও সহনীয় দামের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। এর পাশাপাশি উন্নত বাজার ব্যবস্থাপনাও একটি সংকট। যেগুলোতে নীতি সহায়তার অভাব আছে।

দেশে মাছ উৎপাদনে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি গবেষকেরা স্বীকার করেন। তবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছ আহরণের হিসাব নিয়ে তাদের কারও কারও সংশয় রয়েছে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহফুজুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে সবচেয়ে বেশি আহরিত হয় ইলিশ। এর পাশাপাশি অন্য মাছগুলো কতটা ধরা পড়ে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তবে চাষের ক্ষেত্রে যে বিরাট অগ্রগতি হয়েছে, তা সন্দেহাতীত।

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছ আহরণের তথ্য নিয়ে গবেষকদের সন্দেহের বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. খালেদ কনক *প্রথম আলোকে* বলেন, যেকোনো বিষয় নিয়েই যে কেউ সন্দেহ করতে পারেন। সেই অবকাশ আছে।

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ভূমিকা তুলে ধরে মো. খালেদ কনক বলেন, উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য কার্যালয়গুলোর কাজ, সরকারের ১২৬টি কেন্দ্র থেকে নিরবচ্ছিন্ন পোনা সরবরাহের কারণে চাষের মাছের উৎপাদনে গতি এসেছে। তবে উপজেলা মৎস্য কার্যালয়গুলোতে জনবলসংকটের কথা স্বীকার করেন তিনি।

ঢাকা।

কালবেলা

23 JUN 2026

দশ বছরে চা উৎপাদন বেড়েছে ১১ শতাংশ

- বছরে রপ্তানি ১.৬৪ মিলিয়ন কেজি, বাকিটা বিক্রি হয় স্থানীয় বাজারে
- ২০২৩ সালে উৎপাদন হয় রেকর্ড ১০২ মিলিয়ন কেজি
- ২০১৯ সালে একরপ্রতি সর্বোচ্চ ৭১৬ কেজি উৎপাদন হয়

২০১৬ সালে ৮৫ মিলিয়ন কেজি, ২০২৫ সালে ৯৫

রোকন উদ্দীন ▸▸

দেশে গত ১০ বছরে চায়ের উৎপাদন বেড়েছে ১১ শতাংশ। বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্য বলছে, ২০১৬ সালে দেশে উৎপাদন হয় ৮৫ মিলিয়ন কেজি। ২০২৫ সাল শেষে এ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ৯৫ মিলিয়ন কেজিতে। শিল্প মালিকরা বলছেন, চায়ের উৎপাদন বাড়তে কিছুটা সময় লাগে। একবার গাছ রোপণ করলে তা থেকে পাঁচ বছর লাগে ফলন পেতে। এ ছাড়া দেশের আবহাওয়ারও বিষয় রয়েছে। আবহাওয়া ভালো হলে উৎপাদনও ভালো হয়।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের সর্বশেষ পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে চায়ের মোট উৎপাদন ছিল রেকর্ড ১০২ দশমিক ৯২ মিলিয়ন কেজি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ২০১৯ ও ২০২১ সালে—৯৬ মিলিয়ন কেজি। ২০২৪ সালে চায়ের উৎপাদন হয়েছিল ৯৩ মিলিয়ন কেজি। গত কয়েক দশকের মধ্যে ২০১৭ সালে একরপ্রতি সর্বনিম্ন ৫৯৫ কেজি উৎপাদন হলেও ২০১৯ সালে সর্বোচ্চ ৭১৬ কেজি অর্জন সম্ভব হয়।

বাংলাদেশ চা অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান কামরান তানভিরুর রহমান বলেন, চায়ের উৎপাদন বেশি বাড়িয়ে লাভ নেই। কারণ দেশে চাহিদা খুব বেশি বাড়েনি। চাহিদার বেশি উৎপাদন হলে দাম কমে যায়। এখন যে পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে, তা দিয়ে দেশের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। বাড়তি চা রপ্তানিও করা যায় না। কারণ বৈশ্বিকভাবে চায়ের রপ্তানির বাজারে গতি কিছুটা কম। তবে আমরা চেষ্টা করছি চা রপ্তানি ৮ থেকে ১০ মিলিয়ন কেজিতে নিয়ে যেতে। এখন দেড় থেকে আড়াই মিলিয়ন কেজিতে ওঠানামা করছে।

জানা যায়, সত্তরের দশকে যতটুকু চা উৎপাদন হতো তার সিংহভাগই রপ্তানি হতো। ওই সময় বছরে ৩০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন হতো। আশির দশকে উৎপাদিত চায়ের অর্ধেক রপ্তানি হতো।

চা বোর্ডের তথ্য বলছে, সর্বশেষ ২০২৫ সালে চা রপ্তানি হয়েছে ১ দশমিক ৬৩ মিলিয়ন কেজি, যা মোট উৎপাদনের দেড় শতাংশ মাত্র। যদিও তার আগের বছর চায়ের রপ্তানি ছিল ২ দশমিক ৪৫ মিলিয়ন কেজি। চায়ের নিলাম মূল্যও এ সময় খুব একটা বাড়েনি। ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ নিলাম মূল্য ছিল ২৬২.৯৬ টাকা প্রতি কেজি। সেখানে ২০২৩ সালে তা ১৭১.২৪ টাকায় নেমে আসে। এ দরপতনের মূল কারণ হলো বাজারের 'চাহিদা ও জোগান' নীতি।

২০২৩ সালের রেকর্ড উৎপাদন বাজারে যে অতিরিক্ত জোগান নিশ্চিত করেছিল, তা সরাসরি নিলাম মূল্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে স্বস্তির বিষয় এই যে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে মূল্য ফের বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২০২.৪৬ ও ২৪৭.২০ টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা শিল্পের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের ২০২৬ সালের হালনাগাদ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের চা শিল্প একটি সুসংগঠিত কাঠামোয় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশে সক্রিয় চা বাগানের সংখ্যা ১৭২টি। চা বাগান এবং ক্রমবর্ধমান ক্ষুদ্রায়তন চা চাষের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এ শিল্পের পরিধি এখন আগের তুলনায় অনেক বিস্তৃত। দেশে মোট চা চাষের জমির পরিমাণ ২ লাখ ৯৪ হাজার ৮১ একর। তবে চা বাগানের মোট ভূমির প্রায় ৪৪ শতাংশই বর্তমানে 'অন্যান্য' কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা মূলত শিল্পের বহুমুখীকরণ ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর তৈরিতে ব্যবহার হচ্ছে। অন্যদিকে, চাষযোগ্য ভূমির একটি বড় অংশ এরই মধ্যে নিবিড় চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে বছরে ২০.২৩ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে।

বণিক বার্তা
23 JUN 2026

কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী

ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে চাই বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, ইলিশসম্পদ সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে দীর্ঘমেয়াদি ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শুধু স্থানীয় চাহিদা পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মন্ত্রী আন্তর্জাতিক বাজারে ইলিশ রফতানির সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

গতকাল বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে (বিএআরসি) অনুষ্ঠিত 'ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (দ্বিতীয় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'ইলিশের নিরাপদ বিচরণ ও প্রজননের জন্য নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ এবং পানির গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। শিল্পবর্জ্য ও বিষাক্ত পদার্থ নদীতে নিঃসরণ বন্ধে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'জাটকা নিধন, মা ইলিশ আহরণ ও কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে। অবৈধ জালের ব্যবহার বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। কারণ এগুলো ইলিশসহ দেশের বিভিন্ন দেশীয় মাছের জন্য মারাত্মক হুমকি।'

আমিন উর রশিদ বলেন, 'অধিকাংশ জেলে দাদননির্ভর জীবনযাপন করেন। তাই তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং ভবিষ্যতেও নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।'

মন্ত্রী বলেন, 'ইলিশসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গবেষক, বিশেষজ্ঞ, মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ উপদেষ্টা দল গঠনের বিষয়টি সরকার গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, 'বাংলাদেশের খাদ্য তালিকায় ইলিশের অবস্থান সবার শীর্ষে। বিশ্বের মোট ইলিশ উৎপাদনের ৭০-৮০ শতাংশই বাংলাদেশে উৎপাদন হয়। ফলে বাংলাদেশের ইলিশের প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। তাই ইলিশকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা করতে হবে।'

কর্মশালায় মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. খালেদ কনকের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে আরো ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. আবদুছ ছালাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রকল্প পরিচালক মোল্লা এমদাদুল্যাহ।

দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত রয়েছে

—শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির জানিয়েছেন, 'বর্তমানে দেশে ৬৪ পণ্য ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত রয়েছে।'

গতকাল জাতীয় সংসদে কুমিল্লা-৯ আসনের সরকারি দলের সদস্য মো. আবুল কালামের তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।

মন্ত্রী বলেন, 'নিবন্ধিত জিআই পণ্যের মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র, কৃষিপণ্য, খাদ্যসামগ্রী, হস্তশিল্প এবং প্রাণিসম্পদভিত্তিক বিভিন্ন পণ্য, যা দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটায়।'

নিবন্ধিত জিআই পণ্যের মধ্যে রয়েছে—জামদানি শাড়ি, বাংলাদেশের ইলিশ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ক্ষীরসাপাত আম, নেত্রকোনার বিজয়পুরের সাদামাটি, দিনাজপুরের কাটারিভোগ চাল, বাংলাদেশের কালিজিরা চাল, রংপুরের শতরঞ্জি, রাজশাহী সিল্ক, ঢাকাই মসলিন, বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি, রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলি আম, শেরপুরের তুলসীমালা চাল, বাংলাদেশের শীতলপাটি, বগুড়ার দই, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম। এছাড়া জিআই পণ্যের তালিকায় রয়েছে নাটোরের কাঁচাগোল্লা, বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ীর চমচম, কুমিল্লার রসমালাই, কুষ্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, ইলিশসম্পদ সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে দীর্ঘমেয়াদি ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শুধু স্থানীয় চাহিদা পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মন্ত্রী আন্তর্জাতিক বাজারে ইলিশ রফতানির সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

গতকাল বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে (বিএআরসি) অনুষ্ঠিত 'ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (দ্বিতীয় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'ইলিশের নিরাপদ বিচরণ ও প্রজননের জন্য নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ এবং পানির গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। শিল্পবর্জ্য ও বিষাক্ত পদার্থ নদীতে নিঃসরণ বন্ধে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'জাটকা নিধন, মা ইলিশ আহরণ ও কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে। অবৈধ জালের ব্যবহার বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। কারণ এগুলো ইলিশসহ দেশের বিভিন্ন দেশীয় মাছের জন্য মারাত্মক হুমকি।'

আমিন উর রশিদ বলেন, 'অধিকাংশ জেলে দাদননির্ভর জীবনযাপন করেন। তাই তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং ভবিষ্যতেও নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।'

মন্ত্রী বলেন, 'ইলিশসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গবেষক, বিশেষজ্ঞ, মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ উপদেষ্টা দল গঠনের বিষয়টি সরকার গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, 'বাংলাদেশের খাদ্য তালিকায় ইলিশের অবস্থান সবার শীর্ষে। বিশ্বের মোট ইলিশ উৎপাদনের ৭০-৮০ শতাংশই বাংলাদেশে উৎপাদন হয়। ফলে বাংলাদেশের ইলিশের প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। তাই ইলিশকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা করতে হবে।'

কর্মশালায় মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. খালেদ কনকের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে আরো ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. আবদুছ ছালাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রকল্প পরিচালক মোল্লা এমদাদুল্যাহ।

দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত রয়েছে —শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির জানিয়েছেন, 'বর্তমানে দেশে ৬৪ পণ্য ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত রয়েছে।'

গতকাল জাতীয় সংসদে কুমিল্লা-৯ আসনের সরকারি দলের সদস্য মো. আবুল কালামের তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।

মন্ত্রী বলেন, 'নিবন্ধিত জিআই পণ্যের মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র, কৃষিপণ্য, খাদ্যসামগ্রী, হস্তশিল্প এবং প্রাণিসম্পদভিত্তিক বিভিন্ন পণ্য, যা দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটায়।'

নিবন্ধিত জিআই পণ্যের মধ্যে রয়েছে—জামদানি শাড়ি, বাংলাদেশের ইলিশ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ক্ষীরসাপাত আম, নেত্রকোনার বিজয়পুরের সাদামাটি, দিনাজপুরের কাটারিভোগ চাল, বাংলাদেশের কালিজিরা চাল, রংপুরের শতরঞ্জি, রাজশাহী সিল্ক, ঢাকাই মসলিন, বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি, রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলি আম, শেরপুরের তুলসীমালা চাল, বাংলাদেশের শীতলপাটি, বগুড়ার দই, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম। এছাড়া জিআই পণ্যের তালিকায় রয়েছে নাটোরের কাঁচাগোল্লা, বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ীর চমচম, কুমিল্লার রসমালাই, কুষ্টিয়ার তিলের খাজা, রংপুরের হাড়িভাঙ্গা আম, মৌলভীবাজারের আগর, মৌলভীবাজারের আগর আতর, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার মণ্ডা, যশোরের খেজুরের গুড়, নরসিংদীর অমৃতসাগর কলা, রাজশাহীর মিষ্টি পান, গোপালগঞ্জের রসগোল্লা, জামালপুরের নকশিকাঁথা।

এছাড়া রয়েছে টাঙ্গাইল শাড়ি, নরসিংদীর লটকন, টাঙ্গাইলের মধুপুরের আনারস, ভোলার মহিষের দুধের কাঁচা দই এবং মাগুরার হাজরাপুরি লিচু, সিলেটের মণিপুরি শাড়ি, সিরাজগঞ্জের গামছা, মিরপুরের কাতান শাড়ি, ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলা, কুমিল্লার খাদি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী, গোপালগঞ্জের কাঁসার গহনা, সুন্দরবনের মধু।

The Business Standard

23 JUN 2026

Why Bangladesh charts a design-first path into semiconductors, ditching wafer fabrication

TECHNOLOGY – BANGLADESH

SHOUMIK AHMMED ANIK

Bangladesh has made a calculated bet to leapfrog into the global semiconductor value chain, deliberately bypassing the expensive wafer fabrication race to stake its claim in high-value chip design, testing, and packaging.

Businesses and experts said this targeted, talent-first strategy just received its most significant government support, with the FY2026-27 budget codifying a decade of stability for tech investors.

In a predictable policy move, the government has locked in sweeping customs duty and VAT concessions until June 2031. By extending these exemptions across Electronic Design Automation (EDA) tools, proprietary semiconductor design software, advanced packaging machinery, and specialised testing equipment, policymakers are handing local firms and global entrants the long-term predictability required to scale, businesses said.

The fiscal runway is designed to aggressively fast-track an industry currently generating a modest $8 million in annual exports into a $1 billion powerhouse by 2030. According to the Bangladesh Investment Development Authority (Bida), the blueprint aims to draw foreign and domestic capital into integrated circuit (IC) design, outsourced semiconductor assembly and testing (OSAT), and cutting-edge research and development.

MA Jabbar, president of the Bangladesh Semiconductor Industry Association (BSIA), described it as one of the most important policy decisions for the sector.

"Semiconductor investments, talent development and ecosystem building are long-term endeavours. Companies do not make strategic decisions based on one- or two-year incentives. The extension until 2031 sends a strong signal that Bangladesh is serious about developing a semiconductor ecosystem," he said.

Jabbar said Bangladesh's immediate opportunities lie in IC design, design verification, FPGA and embedded systems, semiconductor testing, packaging and engineering services, rather than wafer fabrication, which requires massive capital investment and decades of technological expertise.

ABM Harun-ur-Rashid, professor of Electrical and Electronic Engineering (EEE), Buet, and a member of Bida's national semiconductor taskforce, said the reduced

I SEE PAGE 4 COL 4

Why Bangladesh charts a design-first path

CONTINUED FROM PAGE 3

VAT and customs duties would significantly lower costs for universities, startups and entrepreneurs engaged in semiconductor research and chip design while encouraging investment in OSAT and packaging.

Bangladesh's biggest strength, he said, is its engineering talent. The country produces around 13,000 electrical and electronic engineering graduates and about 26,000 computer science graduates each year, creating a sizeable pool of engineers for semiconductor design and related services. Prof Harun said the taskforce's roadmap prioritises semiconductor design in the short term, testing and packaging in the medium term and wafer fabrication only as a long-term objective.

That strategy is already beginning to take shape. Companies such as Ulkasemi, Neural Semiconductor, Prime Silicon Technology and Siliconova are providing semiconductor design and engineering services to international clients.

Siliconova, for example, offers services ranging from Register Transfer Level (RTL) design and design verification to physical design, analog and mixed-signal layout, RF design, firmware development and chip packaging.

"Bangladesh currently participates in semiconductor design services and is now working towards chip testing and packaging services," said Md Shafil Hosain, director and technical programme manager at Siliconova.

Shafil said Bangladeshi engineers are already working on advanced chip design projects spanning technology nodes from 180 nanometers to two nanometers. He argued that the biggest misconception is that Bangladesh must first build an expensive fabrication plant, whereas the global semiconductor value chain begins with chip architecture, design, verification and intellectual property development – areas where the country can already compete.

Despite the policy momentum, experts say incentives alone will not be enough.

Prof Harun noted that although universities produce thousands of engineering graduates annually, most require around a year of specialised Very Large Scale Integration (VLSI) training before they become industry-ready.

He also pointed to a shortage of experienced engineers capable of leading complex chip design projects and called for centres of excellence, stronger university-industry collaboration, wider access to industry-standard EDA tools and sustained government-backed training programmes.

Jabbar identified advanced testing facilities, packaging infrastructure, research funding, stronger intellectual property protection and closer industry-academia collaboration as the next priorities for building a complete semiconductor ecosystem.

He also called for easier access to cash incentives, rent-free land in Hi-Tech Parks for packaging and PCB-related activities, and greater government support to attract foreign investment.

The global semiconductor market, driven by demand for artificial intelligence (AI), electric vehicles, 5G and automation, is projected to surpass $1.3 trillion in 2026, according to market research firm Gartner, and continue its strong growth trajectory toward $1.6 trillion by 2030.

Compared with regional competitors, Bangladesh remains at an early stage. India has committed about $10 billion under its semiconductor mission to build fabrication plants and expand chip design and manufacturing, while Vietnam aims for $25 billion in annual semiconductor revenue by 2030 and $50 billion by 2040, along with 100 design firms, 10 packaging and testing plants, and over 50,000 engineers.

However, Jabbar believes, Bangladesh has the potential to become a regional hub for semiconductor design, verification, testing support and engineering services by 2031. Prof Harun's roadmap is even more ambitious, envisioning at least 50 VLSI design companies, three semiconductor testing facilities, two packaging industries and the country's first global semiconductor design centre by the end of the decade.

The Business Standard

23 JUN 2026

India seeks tariff advantage over peers in push to finalise US trade deal

TRADE DEAL – INDIA

REUTERS

The top US trade diplomat will visit India on Tuesday for two-day talks, with New Delhi pushing for a trade pact on terms better than those for other Asian economies as both countries seek to close a deal crucial to mending strained ties.

US Trade Representative Jamieson Greer's trip follows the first meeting in over a year between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump on 17 June on the sidelines of the G7 summit in France.

In addition to uncertainty caused by the trade talks, the death of three Indian sailors in attacks on commercial ships by the US Navy in the Gulf has added to diplomatic tensions.

An initial understanding on trade was reached in February, but uncertainty persists over a continuing US Section 301 probe into alleged overcapacity and forced labour.

New Delhi is seeking a competitive tariff edge over regional peers, including Asean nations like Vietnam.